বিশ্ব বাণিজ্য ও আধিপত্যবাদ

লেখক

মোহাইমিন পাটোয়ারী

সম্পাদক

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা

লেখকের কথা

আমাদের দেশের মানুষরা এমন একটি বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে যে ইংরেজি ভাষা জানা ব্যতীত জ্ঞানের দরজা বন্ধ। একজন ব্যক্তি যেই বিষয়েই উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চান না কেন ইংরেজি ভাষা জানা বাধ্যতামূলক। আপনি তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে জানবেন? ইংরেজি ছাড়া অসম্ভব। আপনি পদার্থবিজ্ঞান শিখবেন? তাও ইংরেজি ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু সবাইকি বিদেশী ভাষায় পারদর্শী হতে পারে? এমনটা কি খুব স্বাভাবিক নয় যে, যেই ব্যক্তি পদার্থবিজ্ঞানে ভালো, সে ইতিহাসে পারদর্শী না? তাহলে যে ব্যক্তি জীববিজ্ঞানে ভালো, সে ইংরেজিতে পারদর্শী হবে কোন যুক্তিতে? এখন আপনারাই বলেন এই দেশে ভালো ডাক্তার বা প্রকৌশলী তৈরি হবে কীভাবে? কেবলমাত্র ভাষাগত দক্ষতার অভাবেই তো অনেক অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী হতাশ হয়ে ঝরে পড়ে।

বিদেশী ভাষায় শিক্ষা অর্জন করে সফল হওয়ার চেষ্টা একটি জাতির জন্য ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ব্যর্থতা। সেজন্যই যেই সমস্ত জাতি প্রযুক্তি, শিল্প ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উচ্চ হতে পেরেছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এবার একটিবার চিন্তা করে দেখুন আপনি একজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। আপনি চাচ্ছেন অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে খুতবা দিবেন কিংবা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন। অথবা আপনি স্কুলে অমনোযোগী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আপনার ব্যবসা প্রতিভা আছে। বর্তমানে চাইছেন একটি ব্যাটারি রিকশার ফ্যাক্টরি দিবেন। আপনার জন্য কি এই বিষয়ে জানার কোন সুযোগ আছে? সেজন্যই আমরা দেখি ধর্ম কেন্দ্রিক সকল আলোচনা হয় আবেগী এবং ব্যবসা হয় নকল। প্রযুক্তি ও জ্ঞানের জগতে মাদ্রাসার ছাত্ররা বা ব্যবসায়ীরা অবদান রাখতে পারছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাখবে কীভাবে? তাদের জন্য কী সেই সুযোগ আছে? আমরা তো নিজ ভাষাতে কিছুই করে যেতে পারি নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সারা জীবন বাংলা পড়ে যখন তারা দেখে সব কিছু ইংরেজিতে, তখন ভাষা রপ্ত করতে করতে শিক্ষা জীবনের সোনালী দিনগুলো শেষ হয়ে যায়। মেধার কি নিদারুণ অপচয়! তার চেয়ে বড় অপচয় সরকারি অর্থের। কেননা যতো কোটি টাকা ইংরেজি শিক্ষার পিছনে ব্যয় করা হয়েছে তার একশ ভাগের এক ভাগও যদি অনুবাদের পিছনে ব্যয় করা হতো, আমরা আজ অন্য জাতির ভাষার উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারতাম। এত এত শক্ষার্থীর এত শ্রমঘন্টা নষ্ট হয় ইংরেজি শেখার পিছে কিন্তু শিক্ষক পর্যন্ত ইংরেজিতে সুন্দর করে কোথা বলতে পারে না বা পত্রিকা পড়ে ঠিকমতো বুঝতে পারে না। গত একশ বছরের চেষ্টাতেও আমাদের বিনিয়োগের ফলাফল শূণ্য যদিনা মেধা পাচারকে ঋণাত্মক ফলাফল হিসেবে গণ্য করেন। এমন হতাশ ও দিগবিভ্রান্ত জাতির জন্য এই অধম বান্দা কাজ করে যাচ্ছে। কোন সরকারি অর্থায়নে না। বরং নিজ ঘুম, সংসারের সময় এবং চাকরির টাকা ত্যাগ করে। এই আশায় যে বাংলা ভাষায় অর্থনীতির জগতকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে যাবেন। সেই প্রচেষ্টা ও স্বপ্ন নিয়েই আমার বইগুলো লেখা যার ধারাবাহিকতা এই বইটি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ব ও ইতিহাস - আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা

বাণিজ্য নীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকার - মোহাইমিন পাটোয়ারি

মুদ্রা-ভিত্তিক বানিজ্য-কেন্দ্রিক আধিপত্যবাদ - মোহাইমিন পাটোয়ারি

সূচীপত্র

লেখকের কথা 2
সূচীপত্র 3
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব ও ইতিহাস 5
শুরুর কথা 6
বাণিজ্যের মুদ্রাদোষ 11
অর্থনীতির মাকড়সা-জাল 12
দক্ষতা আর পণ্যমূল্যের রসায়ন 14
মারামারি, কেন করি? 15
১ম আফিমের যুদ্ধ 18
বাণিজ্য নীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকার 24
ষড়যন্ত্র তত্ত্ব 24
টিকা - বয়কট কূটনীতির পিছনের অর্থনীতি 25
বাণিজ্যের চালিকাশক্তি 26
দেশ স্বাধীন নাকি বাণিজ্য স্বাধীন? 28
মেধা যখন উন্নয়নের চাবিকাঠি 30
টিকা - বিশ্ব ব্যাংকের প্রজেক্ট-কূটনীতি 34
মানুষকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সহজে যেতে দেয়ার ফজিলত… 35
মেধাবীদের দেশে ধরে রাখার কারামত… 36
মুক্ত-শ্রম-বাজারের নিয়ামত… 38
টিকা - ভবিষ্যতমুখী সরকারী নীতির রহমত… 40
রেমিট্যান্স - কল্যাণ নাকি অকল্যাণ 40
শক্তপোক্ত ও দীর্ঘমেয়াদী রেমিট্যান্স প্রবাহের নিনজা টেকনিক… 43
মুদ্রা-ভিত্তিক বানিজ্য-কেন্দ্রিক আধিপত্যবাদ 46
আন্তর্জাতিক মুদ্রায় লেনদেন 46
চিন্তার খোরাকঃ 48
দূরত্ব ও বাণিজ্য 48
মুদ্রা যখন অভিন্ন 50
টিকা - মার্কেন্টিলিজম 52
মুদ্রা যখন ভিন্ন 54
টিকা - কারেকশন মেথড নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা উচিত? 57

অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ও আন্তর্জাতিক অভিন্ন মুদ্রার বিশ্ব 58
রিজার্ভ 59
ফোরেক্স রিজার্ভ কোথায় থাকে? 60
দরপতন ও দেউলিয়াত্ব 61
টিকা - কেন সব দেশের মুদ্রার মান সমান না? 63
স্পেকুলেশন 64
সরকারি হস্তক্ষেপ কি দরকারি? 64
আধুনিক ভোগবাদ কি দেশীয় অর্থনীতির জন্য ভাল? 67
এবার জমবে খেলা 69
সরকার বনাম ব্যাংক 72
টিকা - ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি 73
ডলার উৎপাদন করে কে? 75
ব্রেটন উডস 76
ডলারের চাহিদা 77
ডলারের খেলা 80
পেট্রোডলার 81
টিকা - বাংলাদেশের উপর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ 83
ফেডারেল রিজার্ভ কীভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে 84
বিশ্ব ব্যাংক - পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা মোসাহেব! 85
টিকা - SWIFT 87
ডলারের রাজত্বে ফাটল ধরিল রে… 93
টিকা - বাংলাদেশ যখন দাদন ব্যবসায়ী… 94
বিকল্প বিশ্ব ব্যবস্থা 94
রাশিয়ার শক্তি 95
চীনের উত্থান 98
বাঁকা পরিকল্পনা 100
মানসিক সমস্যা 104
বাংলাদেশের কীভাবে ভূ-রাজনৈতিক শক্তি হতে পারবে? 108
বাংলাদেশ কীভাবে অর্থনৈতিক কূটনীতি করতে পারে? 116
ক্ষমতার খেলা 118
টিকা - উত্তর কোরিয়া 121
আমরা প্রতিহিংসার শিকার হলে কি করবো? 123
লবিং 124

আন্তর্জাতিক গেম থিওরি 127
ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো কীভাবে মাস্টার-প্ল্যান বাস্তবায়িত করে? 129
শেষ কথা 131
লেখকের অন্যান্য বই 134

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব ও ইতিহাস

- আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা

শুরুর কথা

একটা পৃথিবী কল্পনা করুন, যেটাতে আমরা বাস করছি সেটার মতই কিন্তু পৃথিবীটাতে মাত্র ২টা দেশ। চারিদিকে জলরাশি ঘেরা অপূর্ব সুন্দর এই দুইটা দেশের নাম দিলাম সুন্দরপুর আর মনোহরগঞ্জ। এক দেশ থেকে আরেক দেশের মাঝে আছে সাগর। সুতরাং সবাই এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায় নৌকায় করে।

এই দুই দেশেই ১০০ জন করে মানুষ বাস করে। ২৫টা করে পরিবার। প্রত্যেক পরিবারে আছে মা-বাবা-ছেলে-মেয়ে। দুই দেশের প্রতিটা মানুষ কাজ করে। অর্থাৎ তাদের শ্রমশক্তি ১০০ জন। একদম শুরুর দিকের দুনিয়া, সুতরাং কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি (টেকনলজি ও ক্যাপিটাল) এর বালাই নেই। তবে, তাদের কাছে মুদ্রা আর কৃষি পণ্য আছে।

সুন্দরপুরের মানুষজন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে রুপার তৈরি টাকা আর মনোহরগঞ্জের লোকজন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে সোনার তৈরি ডলার। সোনার দাম রুপার চেয়ে বেশি

হওয়ায় ১০০ রুপার টাকা = ১ সোনার ডলার বা সংক্ষেপে আমরা বলব ১ ডলার = ১০০ টাকা।

সুন্দরপুর আর মনোহরগঞ্জে ৪টা জিনিস উৎপাদন হয়। জমিতে চাষাবাদ করে পাওয়া যায় চাল ও ডাল এবং পাশের সাগরে ধরা পড়ে ইলিশ আর তিমি। তিমি থেকে তেল সংগ্রহ করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। এই কাজগুলো করার জন্য সুন্দরপুর আর মনোহরগঞ্জের সবাই কোন ফাঁকিবাজি ছাড়াই বছরে ১০০ ঘন্টা কাজ করে। তাহলে, সুন্দরপুর ও মনোহরগঞ্জের কাছে মোট শ্রমঘন্টা আছে ১০০ * ১০০ = ১০,০০০ শ্রমঘন্টা। কাজ করে যা পাওয়া যায় সেগুলো সেই দেশের মানুষেরাই ভোগ করে, অর্থাৎ কোন আন্তর্জাতিক বানিজ্য হয় না।

এবার, সুন্দরপুরের ১০০ জন ১ বছরে ১০ হাজার শ্রমঘন্টা দিয়ে কি কাজ করে আর কি পরিমাণ উৎপাদন করে সেটার তালিকাটা দেখিঃ
২৫ জন ধান চাষ করে ৩০ হাজার কেজি চাল উৎপাদন করে।
২৫ জন ডাল চাষ করে ১০ হাজার কেজি ডাল উৎপাদন করে।
২৫ জন সাগর থেকে ৫ হাজার কেজি ইলিশ মাছ ধরে।
২৫ জন সাগর থেকে ২.৫ হাজার কেজি তিমির তেল সংগ্রহ করে

মনোহরগঞ্জের ১০০ জন ১ বছরে ১০ হাজার শ্রমঘন্টা দিয়ে কি কাজ করে আর কি পরিমাণ উৎপাদন করে সেটার তালিকাটা দেখিঃ
২৫ জন ধান চাষ করে ৪০ হাজার কেজি চাল উৎপাদন করে।
২৫ জন ডাল চাষ করে ৩০ হাজার কেজি ডাল উৎপাদন করে।
২৫ জন সাগর থেকে ১০ হাজার কেজি ইলিশ মাছ ধরে।
২৫ জন সাগর থেকে ৫ হাজার কেজি তিমির তেল সংগ্রহ করে

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, সুন্দরপুরের মানুষের চেয়ে মনোহরগঞ্জের মানুষজন একই সময় কাজ করলেও বেশি উৎপাদন করে। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকায় দুই দেশের মানুষ নিজেদেরটাই ভোগ করে, সুতরাং সেদিক থেকেও মনোহরগঞ্জের লোকজন বেশি জিনিস ভোগ করতে পারে।

এবার আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই, এই যে সুন্দরপুরের মানুষের চেয়ে মনোহরগঞ্জের লোকজন বেশি উৎপাদন করে আর ভোগ করে, তাহলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য করলে কি মনোহরগঞ্জের উপকার হবে নাকি ক্ষতি? সুন্দরপুরের উপকার হবে নাকি ক্ষতি?

স্বাভাবিকভাবেই কোন এক পক্ষ যদি ক্ষতির মুখে পড়ে, সে বাণিজ্য করতে চাইবে না। তাহলে কি আন্তর্জাতিক বানিজ্য হবে না?
আসুন দেখি, কি ঘটে…
মনোহরগঞ্জ সুন্দরপুরের কাছে ১০ হাজার কেজি ডাল বিক্রি করবে এবং সুন্দরপুর মনোহরগঞ্জের কাছে ১৬ হাজার কেজি চাল বিক্রি করবে। এভাবে সবার চাহিদা মিটিয়ে মোট চালের উৎপাদন ১৪ হাজার কেজি বাড়তি পাওয়া গিয়েছে। এই বাড়তি চাল চাইলে মনোহরগঞ্জ কিনতে পারে অথবা সুন্দরপুর নিজেই ভোগ করতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে, উভয় পক্ষ বাণিজ্য করে আগের চেয়ে বেশি ভোগ করতে পারছে!

মনোহরগঞ্জ ও সুন্দরপুরের মধ্যে কিন্তু সাদাচোখে মনোহরগঞ্জের উৎপাদন সক্ষমতা সব দিক দিয়েই বেশি। কোন দেশের কোন একটা পণ্য উৎপাদন সক্ষমতা যখন অপর দেশের একই পণ্যের উৎপাদন সক্ষমতার তুলনায় এগিয়ে থাকে, তখন এগিয়ে থাকা দেশটা সেই পণ্যের ক্ষেত্রে Absolute Advantage ভোগ করে। এটাকে অর্থনীতির International Trade এর ভাষায় Absolute Advantage Theory বলে। উপরের উদাহরণে, মনোহরগঞ্জের শ্রমিকেরা চাল, ডাল, ইলিশ মাছ ও তিমির তেল সব উৎপাদনেই সুন্দরপুরের চেয়ে এগিয়ে আছে।

মনোহরগঞ্জ আর সুন্দরপুর যখন নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত নিল, যার ফলে উভয় পক্ষ একটা করে পণ্য উৎপাদন করল, অপরের চাহিদা মোতাবেক পণ্য সরবরাহ করল, তখন তারা বাড়তি ১৪ হাজার কেজি চাল ভোগ করার সুযোগ পেল। আপাতদৃষ্টিতে কোন Absolute Advantage না থাকা সত্বেও তুলনামূলক সুবিধা পাওয়ার জন্য এই যে বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত হল, এটাকে বলে Comparative Advantage Theory. বিশ্বাস করেন ভাই, হাজার বছর ধরে মানুষ এই সুবিধার জন্যই ব্যবসা করে আসছে, আর পানির মত সহজ এই জিনিসটাই থিওরি আকারে প্রকাশ করে ডেভিড রিকার্ডো বিখ্যাত হয়ে গেছেন!

উপরের উদাহরণটা প্রমাণ করে যে, একদম সরল একটা অর্থনীতিও কিভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে বা একটা দেশ কেন নিজের সীমান্ত বন্ধ না রেখে বিভিন্ন জাতির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখবে।

বাণিজ্যের চালিকাশক্তি

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সভ্যতার চালিকাশক্তি ছিল বাণিজ্য। কিন্তু কেন এমন হয়? আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় সভ্যতার অস্তিত্ব দেখি না কেন?

১

এর প্রথম কারণ হচ্ছে আমরা সবাই সব কাজে পারদর্শী না। বাস্তব একটি উদারহণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। জার্মানরা যন্ত্র প্রকৌশলে দক্ষ। অপরপক্ষে বাংলাদেশীরা সেলাই কাজে দক্ষ। ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় এবং জার্মানি থেকে বাংলাদেশে লোহা লোক্কড়ের জিনিস আমদানী হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার নিমিত্তে জার্মানরা যদি তৈরি পোশাক এবং বাংলাদেশীরা লোহা লক্কড়ের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে চায়, এর ফলাফল কী দাঁড়াবে? প্রথমত, জার্মানিতে তৈরি পোশাকের দাম বেড়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে নিম্ন মানের যন্ত্রপাতি তৈরি হবে। এর কারণ হচ্ছে আমরা এক এক জাতি এক এক কাজে পারদর্শী। খুব সহজভাবে বললে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও জাতিতে জাতিতে পার্থক্য আছে। তাই প্রত্যেক জাতি নিজের

সেরাটা করে এবং পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে । সেজন্যই লেনদেনের কেন্দ্র গুলোতে শহর গড়ে উঠে। তাই প্রাচীনকালের শহরগুলো নদী বা সমুদ্র বন্দরের কোল ঘেঁষে অবস্থিত ছিল। আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা একই চিত্র দেখতে পাই।

২

দক্ষ জনশক্তির ন্যায় উন্নত প্রযুক্তিও বাণিজ্যের নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বলা যায় প্রযুক্তি হচ্ছে বাণিজ্যের দ্বিতীয় চালিকা শক্তি। ইউরোপে যখন প্রথম যন্ত্র-চালিত তাঁতকল আসে, তখন ভারতীয় উপমহাদেশের তাঁত শিল্প চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর আগে যেখানে ভারত থেকে ইউরোপে তাঁতপণ্য রপ্তানি হতো পরবর্তীতে বিলেত থেকে ভারতে পোশাক আসতে শুরু করে; যা ভারতের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দেয়। এমন আরেকটি উদারহন হচ্ছে মোটরযান। অতীতে বাংলাদেশের যানবাহন বাংলাদেশেই তৈরি করতো। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এই কথাটাই সত্য ছিল। কিন্তু হস্তচালিত নৌকা বা পশু চালিত যান দ্বারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহণ করাটা ছিল ব্যয়বহুল। চিন্তা করে দেখুন, একটি গরুর গাড়ি বা নৌকাকে সাত দিনের রাস্তা পাড়ি দিতে গাড়ির চালককে সাত দিনের মজুরি খরচ দিতে হতো, তার সাথে সাত দিনের গাড়ি ভাড়া, পশু খাদ্য ও রাতে থাকার খরচতো আছেই। সেই তুলনায় মোটরযানে এই একই রাস্তা মাত্র কয়েক ঘন্টার মজুরি ও তেল খরচে খুব কম মূল্যে পরিবহন করা যায়। এভাবেই যন্ত্রযানের আবিষ্কার দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থা সুলভ ও দ্রুত হয়ে গেল। কিন্তু তার অপর ফলাফল স্বরূপ আমরা হয়ে গেল আমদানীকারক এবং যন্ত্রযান প্রস্তুতকারক রাষ্ট্রগুলো হয়ে গেল রপ্তানীকারক। অর্থাৎ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাণিজ্যের চালিকা শক্তি এবং ভারসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩

সবশেষে, ভৌগলিক পার্থক্য বাণিজ্যের চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। উদারহণস্বরূপ, সিলেটে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু সেখানে উঁচু উঁচু টিলা থাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না। চা চাষের জন্য এটি অতি উত্তম পরিবেশ। অপরপক্ষে চরাঞ্চলের মাটিতে প্রচুর

পরিমাণ বালি থাকে যা বাদাম চাষের অতি উত্তম পরিবেশ। এখন যমুনার চরের বাসিন্দারা যদি নিজ গ্রামে সব ধরনের ফসল ফলাতে সিদ্ধান্ত নিলে এর ফলাফল কী দাঁড়াবে? চরের যেই জমিতে একজন কৃষক বিপুল পরিমাণ বাদাম ফলাতেন এখন সেখানে তিনি এক মুঠ চা কিংবা এক মণ ধানও উৎপাদনও করতে পারবেন না। সেজন্যই কেউ বাদাম উৎপাদন করে রপ্তানি করেন এবং কেউ চা চাষ করে রপ্তানি করেন। এমনটা করাই সবার জন্য উত্তম যা বাণিজ্যের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

বাণিজ্যের মুদ্রাদোষ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন করা উচিত, এই প্রশ্নের পরপরই চলে আসে মুদ্রার ব্যাপার-স্যাপার। কারণ, চাল-ডাল যাই কিনি না কেন, মুদ্রার মূল্য উঠানামা করলে আমাদের ভোগও যে উঠানামা করে!

মনে আছে, মনোহরগঞ্জের সোনার মুদ্রা ১ ডলার সমান সুন্দরপুরের রুপার মুদ্রায় ১০০ টাকা?[1] সুন্দরপুরের ডালের ব্যাপারি তাজউদ্দীন মনোহরগঞ্জ থেকে ১ টন (বা ১০০০ কেজি) ডাল আমদানী করবে। যদি ১ কেজি ডালের দাম ১ ডলার হয়, তাহলে ১ টন ডাল কিনতে তার মোট ১* ১০০০ = ১০০০ ডলার বা ১০০ * ১০০০ = ১ লাখ টাকা লাগবে।

তাজউদ্দীন যখন পরের বার ডাল কিনতে যাবে, তখন ১ ডলার = ৫০ টাকা হয়ে গেলে কি ঘটবে?

ঠিক ধরেছেন, তাজউদ্দীন তখন ১ লাখ টাকায় মোট ২ টন ডাল কিনতে পারবে! কিংবা ১ টন মাত্র ৫০ হাজার টাকাতেই কিনে ফেলতে পারবে।

[1] কোন দেশের ১ মুদ্রা সমান অপর কোন দেশের ১০০ মুদ্রা কেন? মুদ্রামানের এই তারতম্যের উত্তর জানতে পড়ুন 'টিকা - কেন সব দেশের মুদ্রার মান সমান না?'

কিন্তু যদি, তাজউদ্দীন পরের বার ডাল কিনতে গিয়ে দেখেন ১ ডলার = ২০০ টাকা হয়ে গেছে, তাহলে?

এবারো ঠিক ধরেছেন, তাজউদ্দীন তখন ১ লাখ টাকায় মাত্র আধ টন (৫০০ কেজি) বা আগের চেয়ে অর্ধেক ডাল কিনতে পারবে। অথবা, এই ১ টন ডাল কিনতে তাজউদ্দীনকে আগের চেয়ে ২ গুণ বা ২ লাখ টাকা খরচ করতে হবে।

প্রথমে, ১ ডলার = ১০০ টাকা ছিল।
যখন ১ ডলার = ৫০ টাকা হল, তখন তাকে বলে ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হওয়া।
যখন ১ ডলার = ২০০ টাকা হল, তখন তাকে বলে ডলারের বিপরীতে টাকা দুর্বল হওয়া।

অর্থাৎ, টাকা শক্তিশালী হওয়া মানে ডলার কিনতে আগের চেয়ে কম টাকা লাগা এবং টাকা দুর্বল হওয়া মানে ডলার কিনতে আগের চেয়ে টাকা বেশি লাগা।

মনোহরগঞ্জের অর্থনীতি শক্তিশালী, তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বর্তমানে ডলারেই হয়, সেজন্য ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হলে বা অল্প টাকায় অধিক ডলার পেলে সুন্দরপুরের পুরো দেশের সকল আমদানীকারক ব্যবসায়ীরা উপকৃত হয়। এতে করে বেশি জিনিস আমদানী করা যায়, দেশের মানুষ কম টাকায় বেশি বেশি বিদেশী পণ্য ভোগ করতে পারে।

অপরদিকে, ডলারের বিপরীতে টাকা দুর্বল হলে সুন্দরপুর দেশের রফতানীকারক ব্যবসায়ীরা বেশি উপকৃত হয়। কেন জানেন? তখন তারা তাদের পণ্যের মূল্য হিসেবে যে ডলার পেয়েছে, সেটা ভাঙ্গিয়ে আগের চেয়ে বেশি টাকা পায়! এর ফলে, ডলারের বিপরীতে

টাকা দুর্বল হলে রফতানী বেড়ে যায়। বেশি বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ বাড়ে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ে এবং দেশের আয় বাড়ে।

অর্থনীতির মাকড়সা-জাল

অনেক বছর পার হয়েছে, মনোহরগঞ্জ আর সুন্দরপুরের অর্থনীতি আরো এগিয়েছে। দক্ষিণে আরেকটা দ্বীপরাষ্ট্র আবিষ্কার করেছে মনোহরগঞ্জের নাবিকেরা, সেটার নাম উত্তমপাড়া। সবগুলো দেশই অপূর্ব সুন্দর। পাহাড়, নদী, বন-জঙ্গল, খেত-খামার কোন কিছুরই অভাব নেই। গ্রামের বাসিন্দারা অত্যন্ত কর্মদক্ষ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাদের বিভিন্ন জন এখন বিভিন্ন ধরণের কাজ করে। কেউ কাপড় বোনে, কেউ কাঠের কাজ করে, কেউ মাছ ধরে ইত্যাদি।

৩টা দেশই একের উন্নতি দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় এবং একের অবনতি দ্বারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধরুন, মনোহরগঞ্জে ডালের আবাদ অতি বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেল। তাহলে, ৩ দেশেই ডালের টান পড়বে। কারণ, বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য কেউ আর নিজের ডাল নিজে উৎপাদন করে না। ডালের চালান আসে মনোহরগঞ্জ থেকে।
আবার, উত্তমপাড়ার নতুন স্বেচ্ছাচারী শাসক ঘোষণা দিল যে, এখন থেকে তিমির তেলের দাম উত্তমপাড়ার নিজস্ব তামার মুদ্রা রুপিতে শোধ করতে হবে। এখন, এই বিষয়টা মনোহরগঞ্জ আর সুন্দরপুরের জন্য চিন্তার বিষয়। তাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ রুপি না থাকলে এই দুই দেশেরই তিমির তেলে টান পড়বে।
এদিকে যদি সুন্দরপুর আর উত্তমপাড়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাহলে সুন্দরপুরের চাষিরা সৈন্যের বেশে ইলিশ ধরা নৌকায় চড়ে যুদ্ধে যাবে। অপরদিকে, উত্তমপাড়ার চাষীরাও তিমির তেল-বাহী জাহাজে চেপে যুদ্ধে আসবে। ফলে, চালের উৎপাদন, ইলিশের জন্য মাছধরা নৌকা, তিমির তেলের ট্যাংকার সবই ব্যস্ত থাকবে যুদ্ধে। তখন ৩ দেশেরই চাল,

ইলিশ আর তেলে টান পড়বে এবং বাণিজ্যের অভাবে ৩ দেশেরই অর্থনীতি মন্দায় চলে যাবে।

আমাদের বর্তমান বিশ্বটাও উপরের উদাহরণের মতো। এখানে একটি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে যা উৎপাদন করতো সেটির সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাকের উপর হামলা চালায় তখন বিশ্ব বাজারে তেল সরবরাহে বিঘ্ন দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী জ্বালানী তেলের মূল্য বেড়ে যায় এবং এর খেসারত পোহাতে হয় আমাদের সবাইকে। একইভাবে ২০১২ সালে যখন ভয়ংকর বন্যা হয় থাইল্যান্ডে, তখন বিশ্ব বাজারে হার্ডডিস্কের দাম ৪৭ শতাংশ বেড়ে যায়। ২০২২ সালে ইউক্রেনের উপর রাশিয়া যখন হামলা চালায় তখন বিশ্ব বাজারে গম সরবরাহে বিঘ্ন দেখা দেয় এবং গমের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। আবার ২০১৫ সালে তেল সমৃদ্ধ ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

এজন্যই পারষ্পরিক সুসম্পর্ক ও বাণিজ্য সবার জন্য কল্যাণকর এবং কলহ ও দ্বন্দ সবার জন্য ক্ষতিকর। একবার চিন্তা করে দেখুন, সৌদি আরব যদি হুট করে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে জাপানের কাছে তেল বিক্রি করবে না, তখন কী হবে? প্রথমত, এমন সিদ্ধান্তে জাপান বেশ বিপদেই পড়বে। কেননা জাপানে গাড়ি নির্মাণ কারখানা আছে সত্য, তবে তেলের কোন খনি নেই। তাই তাদের দেশের যানবাহনগুলো তেলের অভাবে স্থবির হয়ে পড়ে রইবে। প্রতিশোধস্বরূপ, জাপান যদি বলে সৌদি আরবে আমরা আর গাড়ি বিক্রি করবে না, তখন সৌদি আরব নিজেও বেশ বিপদে পড়বে। কারণ সৌদি আরবে অনেক তেলের খনি আছে সত্য, তবে গাড়ি নির্মাণ করার কোন কারখানা নেই!

এক কথায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। ক্রেতা না থাকলে যেমন বিক্রেতা অচল, ঠিক তেমনি বিক্রেতা না থাকলে ক্রেতাও অচল। এই কথাগুলো

একটি দেশের অভ্যন্তরে দুইটি ভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, চাঁদপুরে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। কিন্তু চাঁদপুর শহরের বাসিন্দারা অল্প কিছু ইলিশ মাছ খেয়ে বাকিটা রপ্তানি করে দেয়। এখন, চাঁদপুর শহরের মেয়র যদি ঘোষণা করে,

“আজ থেকে আমরা আর ইলিশ মাছ রপ্তানি করবো না। নিজেদের পণ্য নিজেরাই খেয়ে ধন্য হবো।”

এর দ্বারা চাঁদপুর শহরের জেলে সম্প্রদায়, মাছ ব্যবসায়ী ও পরিবহন শ্রমিকরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপরপক্ষে সারা দেশের মানুষও চাঁদপুরের ইলিশের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। এই ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে যদি চাঁদপুরের উপর বাকি জেলাগুলো পাল্টা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এজন্যই, অর্থনীতির ভাষায় বলে “co-operation makes everyone better off.”, অর্থাৎ, সুসম্পর্ক সকলকে লাভবান করে।

দক্ষতা আর পণ্যমূল্যের রসায়ন

সুন্দরপুরের চাষিদের একটা অংশ যদি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক বছরের জন্য চাষাবাদ করতে পারল না। তাতে কি জমি অনাবাদী পড়ে রইবে? ফসলের ঘাটতি দেখা দিলে কিংবা একজনের জায়গায় অপরজনের কাজের সুযোগ আসলে কেউ না কেউ সেটা কাজে লাগাবে, তাই না?

বিষয়টা এত সহজ-সরল না। ধরুন, ১০০ চাষী অসুস্থ হওয়ায়, তাদের জমিতে তাদের বউরা চাষ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাহলে কি সবকিছু আগের সমান থাকবে? প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে, না। কারণ সবাই সব কাজে সমান পারদর্শী না। যেহেতু কৃষিকাজে চাষিদের বউরা তুলনামূলক অদক্ষ এবং তাদের সময় সীমাবদ্ধ, তারা আগের সমপরিমাণ ফসল

উৎপাদন করতে পারবে না। এভাবে সুন্দরপুরের মোট চালের উৎপাদন কমে আসবে এবং চালের দাম বেড়ে যাবে।

আবার ধরুন, উত্তমপাড়ায় ঘুর্ণিঝড়ে কিছু জেলে মারা গেল। তখন অদক্ষ, বেকার বা ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেরা মাছ ধরতে আসবে। স্বভাবতই তাদের হাত মাছ ধরায় দক্ষ হবে না। তাই বেশি বেশি জাল মেরে তারা কম কম মাছ ধরতে পারবে এবং এভাবে বাজারে ইলিশের দাম বেড়ে যাবে।

দক্ষ জনশক্তির মত উন্নত প্রযুক্তিও দাম কমানোতে ভূমিকা পালন করে। যদি এমন হয় যে, সুন্দরপুরের চাষিদের মরণদশা দেখে উত্তমপাড়া একটা স্পেশাল প্রজেক্ট হাতে নিল ও খুব উচ্চফলনশীল ধান চাষ শুরু করে দিল। ফলে, ৩ দেশের মোট চালের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেল। এতে সুন্দরপুরের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও প্রযুক্তিকেন্দ্রিক একটা পুশ পুরো চালের বাজারকে গতিশীল করে পণ্যের দাম কমিয়ে দিয়েছে।

একটা বাস্তব উদাহরণ দেই। মোটরযান নির্মাণের আগে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পণ্য পরিবহণ করতে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি বা ইঞ্জিনবিহীন নৌকা ব্যবহার করা হতো। এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। একটি গরুর গাড়িকে সাত দিনের রাস্তা পাড়ি দেওয়াতে গাড়ির চালককে সাত দিনের মজুরি, গরুকে সাত দিনের খাবার, গাড়ি খরচ এবং রাতে বিশ্রামের জন্য সরাইখানার খরচ দিতে হতো। এখন সেই রাস্তা ট্রাকে করে মাত্র কয়েক ঘন্টায় পাড়ি দেওয়া সম্ভব। তাই কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টার মজুরি, কয়েক ঘন্টার গাড়ি খরচ ও কয়েক ঘন্টার তেল খরচে খুবই সুলভে আমরা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে মালামাল পরিবহন করতে পারছি। এমন আরেকটি সুন্দর উদাহরণ হল ‘এসেম্বলি লাইন প্রযুক্তি’। একদা মোটরযান খুব দামী পণ্য ছিল। হেনরি ফোর্ড এসেম্বলি লাইন প্রযুক্তি আবিষ্কার করার পরবর্তীতে এর দাম একেবারে কমে আসে। এভাবে একদা বিলাসবহুল পণ্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হয়।

মারামারি, কেন করি?

আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক এবং বাণিজ্য আসলেই যদি এতটা কল্যাণকর হয়, বিশ্ব জুড়ে আমরা সংঘাত, অবরোধ, যুদ্ধ, কোন্দল চলতে দেখি কেন? এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটার উত্তর জানাটাও একজন সচেতন মানুষের জন্য জরুরি।

আমরা দেখেছি যে, বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক সবার জন্য সুফল বয়ে আনে। কিন্তু কারো উৎপাদন সক্ষমতা যদি বাজারে তার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার তুলনায় বেশি থাকে, তখন পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। ধরুন, একটি দেশের মানুষ বেকার বসে আছে, কলকারখানা খালি পড়ে আছে, জমি অনাবাদি পড়ে আছে। তখন সরকার/রাজা কি করবে?

নতুন আবিষ্কৃত উত্তমপাড়ায় ২টা নতুন পণ্য পাওয়া গিয়েছে। সেখানের লোকজন নারিকেল চাষ করে আর ঝিনুক থেকে মুক্তা উৎপাদন করে। তাহলে, আমাদের এই নতুন বিশ্বে এখন ছোট ছোট অনেক পণ্য থাকলেও মূল পণ্য ৬টি - চাল, ডাল, ইলিশ, তিমির তেল, নারিকেল ও মুক্তো। শুরুতে মনোহরগঞ্জ আর সুন্দরপুরে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২০০ জন। এখন সময় বদলেছে। ৩ দেশেই এখন হাজার হাজার নাগরিক। মনোহরগঞ্জ এত ভাল ডাল উৎপাদন করে যে উত্তমপাড়ায় আর ডালের উৎপাদন করা লাগে না। উত্তমপাড়ায় ডাল ব্যবসায়ী সমিতি কি শুধু আমদানীই করবে?
একইভাবে উত্তমপাড়ার তিমির তেলের ব্যবসা রমরমা। মনোহরগঞ্জের ডাল ব্যবসায়ীদের দেখে উত্তমপাড়ার ডাল ব্যবসায়ীরা যেভাবে দাঁত কিড়মিড় করে, ঠিক সেভাবে উত্তমপাড়ার তিমির তেল ব্যবসায়ীদের দেখে মনোহরগঞ্জের তিমির তেলের ব্যবসায়ীরা জ্বলে-পুড়ে যায়।

উত্তমপাড়ার তিমির তেল ব্যবসায়ী সমিতির নতুন সভাপতি এসেছে। সে ডাল ব্যবসায়ী সমিতির প্রধাণ আর সেই দেশের সেনাপ্রধাণের সাথে লাঞ্চ খেতে খেতে আলাপ করে দেখলো যে, উত্তমপাড়া থেকে ৩ দেশেই ডাল আর তিমির তেল পাঠানো গেলে রাষ্ট্রের আয় ৩ গুণ বেড়ে যাবে। সেই বাড়তি আয় দিয়ে গভীর সমুদ্রে কৃত্রিম আইল্যান্ড বানিয়ে অনেক বড় একটা নতুন জনপদ ও বাজার বানানো যাবে। কিন্তু মনোহরগঞ্জের সাথে লাগতে যাবে কে? সেনাপ্রধাণ চিন্তিত। ডাল ব্যবসায়ী সমিতির প্রধাণ বললেন, আজ্ঞে একটা বুদ্ধি শুনেন। আমরা সুন্দরপুরের ডাল ব্যবসায়ী সমিতির প্রধাণকে গিয়ে বলি যে আগামী ৩ বছর আমাদের থেকে ডাল না নিলে তিমির তেল কিনতে হলে ৪০% ভ্যাট দিতে হবে। আর মনোহরগঞ্জে গিয়ে বলবো যে, ওদের যেহেতু প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে না, সুতরাং আমাদেরকে ৪০% ডিস্কাউন্টে দিতে। কেমন হয়? বুদ্ধি শুনে তিমির তেল ব্যবসায়ী সমিতির প্রধাণ বেশ তারিফ করলেন।

এবার সেনাপ্রধাণ বুদ্ধি দিলেন, আমাদের সেনাবাহিনীর পরীক্ষামূলক ডাল ক্ষেতে নতুন একটা ডাল ভাইরাস আবিষ্কার করেছি। সেটা যদি আমাদের এবারে উত্তমপাড়া থেকে মনোহরগঞ্জের নারিকেলের চালানে মিশিয়ে দেই, তাহলে ওদের ডালের ব্যবসায় পুরো ধস নামবে। এক চান্সেই আমরা পুরো খাত নিজেদের করে নিতে পারব।

যেই কথা সেই কাজ। ৫ বছরের মধ্যে মনোহরগঞ্জের ডালের ব্যবসা একরকম বন্ধ হয়ে গেল। সুন্দরপুর আর মনোহরগঞ্জের ডাল কেনে না, রোগ-বালাইয়ে ডাল উৎপাদন গেল অনেক কমে এবং একদা প্রতাপশালী মনোহরগঞ্জ এবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উত্তমপাড়াকে বেশ সমীহ করে চলে। মনোহরগঞ্জের গোয়েন্দা বাহিনী যতদিনে আবিষ্কার করবে যে ডালের এই রোগ কোথা থেকে আসলো, ততদিনে আন্তর্জাতিক বাজার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

আপনার চেনা বিশ্বে এমন কয়টা সেক্টর জানা আছে যেখানে একদা প্রতাপশালী কোন উৎপাদক এখন ঐ সেক্টরে একেবারেই অপরিচিত কেউ? এই পরিবর্তনে কতটা সেই রাষ্ট্রের নিজস্ব সমস্যা ও দুর্বিপাক দায়ী আর কতটা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের দাবার চালের ফল? এই বিষয়গুলো বুঝতে আপনাকে-আমাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাকড়সার জাল ধরে ধরে আগানো শিখতে হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতে পাটের চাষ হয়। ১৯৭০ এর দিকে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বাংলার এক-তৃতীয়াংশ ব্যস্ত ছিল পাট চাষে। সেই সোনালী আঁশের সুদিন কিভাবে হারালো? আমরা কি পলিথিনের কাছে হেরে গিয়েছি? ভারতেও কি পাটের অবস্থা খারাপ? বাংলাদেশ-ভারত প্রসংগ আসলেই সবার নাকে অন্যরকম গন্ধ লেগে যায়। গন্ধ খোঁজা বাদ দিন। অর্থনীতি পড়তে বসলে আপনাকে নির্মোহ হতে হবে, ভাবতে পারতে হবে কিভাবে কোন কারণে কি ঘটল কিংবা কোন কৌশলের কারণে কি ঘটছে...

বাংলার পাটের সুদিন গিয়েছে, ভারতের যায়নি। এটা ভারতের কৌশলে জয় আর বাংলাদেশের কৌশলগত পরাজয়। এই কৌশলের একটা নমুনা দেই। ভারত মোট যে পরিমাণ পাটের বস্তা আমদানি করত, তার ৯০ ভাগই যেত বাংলাদেশ থেকে। ভারতীয় বিভিন্ন কোম্পানী তাদের মালামাল প্যাকেট করে দেশে ও বিদেশে রফতানী করত। কেন সেই ব্যাগ তারা কিনতো? কারণ, বাংলাদেশের সেই পাটের ব্যাগগুলো তারা তুলনামূলক সস্তায় পেত। বাংলাদেশের পাটের ব্যাগ ভারতীয় কোম্পানী ব্যবহার করলে, ভারতীয় পাট কোম্পানীর ব্যাগ কেনা কমে গেল না? এটাতো ভারতের চেম্বার অব কমার্সের জন্য একটা চিন্তার বিষয়। কিন্তু তারাতো সরাসরি এইসব ব্যবসায়ীকে বলতে পারে না যে, ভাই দেশের জিনিস বেশি টাকায় কিনেন, বিদেশী জিনিস ছাড়েন। অথচ, তাদেরক একটা পন্থা বের করতে হবে। পন্থাটা কি ছিল জানেন? ২০০১ সালে ভারতের পাট কমিশনার আমদানি করা পাটের বস্তার গায়ে প্রিন্ট আকারে 'ব্যাগ মেইড ইন কান্ট্রি অব অরিজিন' লেখাযুক্ত স্টিকার লাগানো বাধ্যতামূলক করে শর্ত জারি করে। অর্থাৎ, বাংলাদেশ থেকে

যেসব পাটের ব্যাগ রফতানী হবে, সেগুলোর গায়ে বাধ্যতামূলক ‘Made in Bangladesh’ লিখে দিতে হবে। এবার বুঝেন ব্যাপারটা, ভারতীয় কোন কোম্পানীর তৈরি পণ্যের পাটের প্যাকেটের গায়ে যদি ‘Made in Bangladesh’ লেখা থাকে, তাহলে কি সেটা আর কোন ভারতীয় কোম্পানী ব্যবহার করতে পারবে? মজার ব্যাপার হল, পাটের বস্তা ছাড়া প্যাকেজিংয়ের অন্য কোনো পণ্যের ওপর এ ধরনের শর্তারোপ করেনি ভারত। তাহলে শুধু পাটের বস্তার ক্ষেত্রে কেন এ ধরনের শর্তারোপ করা হলো? কারণ আর কিছুই না, বাংলাদেশের পাটের ব্যাগ বা বস্তার বিপুল চাহিদা ছিল ভারতে। আর এই ছোট্ট নিয়মটার ফলাফল কি হল? রাতারাতি বাংলাদেশ থেকে ভারতে সকল পাটের বস্তা বিক্রি বন্ধ![2] এবার বুঝলেন, কৌশলগত অবস্থান কি জিনিস?

ফিকশনের চেয়ে মানুষের ইতিহাস অনেক বেশি রোমাঞ্চকর ও বৈচিত্র্যময় কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাই, পাঠকদের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কেন এক দেশ আরেক দেশের সাথে মারামারি করে সেটার একটা রোমাঞ্চকর গল্প বলি…

১ম আফিমের যুদ্ধ

১৭শ-১৮শ শতকে বড় বড় সুপার পাওয়াররা বিশ্বের অন্যান্য সকল এলাকায় কেন কলোনী করেছে, সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। এইসব কলোনী করার পিছনে স্রেফ অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণই অনেক বড় একটা মোটিভেশন। তাই আজকের গল্পে কাউকে কলোনী করে ফেলার কাহিনী বলছি না, বলছি এমন একটা কাহিনী যেখানে স্রেফ ব্যবসায়িক স্বার্থে কিভাবে একটা সুপার পাওয়ার আরেকটা সুপার পাওয়ারের সাথে টক্কর দেয়…

[2] https://www.bd-pratidin.com/last-page/2016/08/30/166567

১৭৯২ সাল, ব্রিটিশরা ততদিনে আমেরিকার সাথে যুদ্ধে হেরে উত্তর আমেরিকার মত খুবই লাভজনক একটা কলোনী হারিয়েছে। ব্রিটেনে চলছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলুশন, লাগছে অনেক কাঁচামাল, নানান নতুন মেটাল ও অর্থ। নব্য ধনিক শ্রেনীর কাছে বাড়ছে বিলাস দ্রব্যের চাহিদা। এগুলো নিশ্চিত করতে অনেকগুলো কলোনীতে কমবেশি সংঘাত চলছে ও কোনমতে সাম্রাজ্য চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। ব্রিটেনের দরকার এখন নতুন ব্যবসা, এমন কোন আয়ের উৎস যা তাদেরকে এই সংকটের সময় স্বচ্ছল করবে।

১৮শ শতকের এই সময়টাতে দুনিয়ার অন্যতম বাণিজ্য আকর্ষণ ছিল চীন। ইউরোপিয়ানদের কাছে চীনের সিল্ক, চীনামাটির পাত্র আর চা-এর কদর ছিল খুবই বেশি। ব্রিটেনের মানুষের কাছে চীনা চা এর এতই কদর ছিল যে, তারা সেই সময়ে বছরে ১ কোটি পাউন্ডের মত চা আমদানী করত আর এতে করে ব্রিটেনের মোট বার্ষিক আয়ের ১০% চলে যেত চীনা চা আমদানীতে! তখন, গড়ে প্রত্যেক বাড়ির মানুষের আয়ের ৫% খরচ হত চায়ের পিছনে। এদিকে, এত রৌপ্য মুদ্রা চীনে চলে যাচ্ছে, সেই টাকা আসবে কোথা থেকে? ততদিনে সংঘাতে পড়ে দক্ষিণ আমেরিকার রুপার খনি থেকে ব্রিটেনের দখল চলে গিয়েছে, যুদ্ধে প্রচুর খরচ হচ্ছে আর সাধের সেনাসজ্জিত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইন্ডিয়া অপারেশন লসের মুখ দেখছে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখন ২৮ মিলিয়ন পাউন্ড দেনায় ডুবে আছে। কোথাও সুখবর নেই আর চা-এর পিছনে কোটি কোটি টাকা চলে যাচ্ছে চীনে। এটা ব্রিটেনের নীতিনির্ধারকদের জন্য হজম করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ল।

এদিকে, চীন তখনকরা ব্রিটেনের মতই মারাত্মক রেসিস্ট ও নিজের ছাড়া কাউরে গায়ে লাগায় না টাইপ উন্নাসিক একটা জাতি। তারা ইউরোপিয়ানদের এক বিন্দু বিশ্বাস করতো না আর বাইরের কোন রাজা/বাদশা/প্রধাণমন্ত্রীকে এক পয়সা মূল্য দেয় না। তবে, তারা ব্যবসা বুঝত। ব্যবসা বলতে, আমিও ব্যবসা করি, তুমিও ব্যবসা কর, এসো মিলেমিশে খাই, এই টাইপ না। আমি ব্যবসা করব, তুমি কিনবা আর আমি খাব, তুমি দেখবা টাইপ ব্যবসা বুঝত। তারা বাইরের কোন বণিককে চীনে প্রবেশ করতে দিত না। সকল

বৈদেশিক বাণিজ্য করতে হবে পুরো চীনের মাত্র ১টা পোর্টে, ক্যানটন পোর্ট থেকে। আর সকল বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে হংক নামে একটা সংস্থা। ফলে, যা হওয়ার তাই হল, চীনে প্রচুর পরিমাণ স্মাগলার বেড়ে গেল আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মত 'সাধু' সংস্থাগুলোর ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়ল।

ব্রিটেনের পক্ষে দিনের পর দিন চীনের সাথে বাণিজ্য বৈষম্য মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর হয়ে গেল। ব্রিটেন খালি কিনছে আর চীন কিছুই কিনছে না, এটা ব্রিটেনের হজম হচ্ছে না। তাদের এই কষ্টের ফসল হিসেবে একটা প্রোডাক্ট তারা পেল যেটা চীনের কাছে বেচা যাবে, আফিম! চীনের মানুষজন আফিমে আসক্ত, প্রচুর পরিমাণে তারা আফিম খায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এটাকে বড় একটা সুযোগ হিসেবে দেখল। কিন্তু ঝামেলা হল, আফিম চীনে নিষিদ্ধ পণ্য, সরাসরি ব্যবসা করা যাবে না। এদিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটা অতি 'ভাল' সংস্থা, তারা কিভাবে চীনে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মাদক ব্যবসায় জড়াবে? এটা মোটেই ভাল দেখায় না, তাই না? তাই তারা ফন্দি বের করলো, ইন্ডিয়ার যেসব জমিতে তুলা চাষ করার কথা সেগুলো আফিম চাষে ব্যবহার করা হবে। কারণ, ইন্ডিয়াতে তুলা চাষ মার খেয়েছে, আর ব্রিটেনের তুলার চাহিদা মেটাতে ততদিনে আমেরিকা ও মিশরে লাভজনক বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। চীনের সবচেয়ে কাছের যে এলাকায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ আছে, সেই কলকাতাতে তারা আফিম অপারেশন সেট করলো। যেহেতু আফিম নিয়ে চীনে যাওয়া যাচ্ছে না, তারা এই আফিম উৎপাদন ও প্যাকেজ করে চীনা স্মাগলারদের কাছে বেচতে লাগলো। দেখা গেল, চীনে উৎপাদিত আফিমের চেয়ে ভারতের আফিম অনেক বেশি শক্তিশালী আর তাই চীনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেল এই আফিম। ১৮৩৫ এর দিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আফিম ব্যবসা তুঙ্গে উঠল, তারা তখন বার্ষিক প্রায় ৩০ লাখ পাউন্ড আফিম বেচে চীনে। এটা আরো বাড়ছে, ১৮৩৩ এই রমরমা ব্যবসা দেখে ব্রিটেন আফিমের ব্যবসায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মনোপলি ভেঙ্গে দেয়, ফলে আরো অনেকে যোগ দেয় এই কাজে। দাম কমতে থাকে, বাড়তে থাকে বেচাকেনা। ১৮৩৯ সালেই বিক্রি হয় সাড়ে ৫ মিলিয়ন পাউন্ড বা ৫৫ লাখ পাউন্ড

আফিম! আফিম বেচা টাকায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সুদিন ফিরলো আর ব্রিটেনের বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসলো।

চীনতো বসে নেই, সে জানে কি চলছে, ইন্ডিয়ার প্রিমিয়াম আফিমে তখন চীনারা বেঘোর। যে চীন কিছুতেই চায়না মুদ্রা হারাতে, তাদের দেশ থেকে মুহুর্মুহু রুপা বের হয়ে যাচ্ছে সেটা কিভাবে সহ্য করা সম্ভব? চীনা সম্রাট দাউগুয়াং নতুন প্রতিনিধি লিন জেসুকে পাঠালেন আফিম বাণিজ্য বন্ধে। কঠোর লিন জেসু (Lin Xesu) নামলেন কাজে। স্মাগলারদের রাস্তা বন্ধ করলেন, হাজার হাজার স্মাগলার গ্রেফতার করলেন, মানুষকে ধরে ধরে রিহ্যাবিলিটেশনে পাঠালেন, ভাংলেন আফিম খাওয়ার পাইপ আর বন্ধ করে দিলেন আফিমের ডেরাগুলোকে। এরপর করলেন সবচেয়ে ভয়ংকর কাজ, ব্রিটিশ বণিকদেরকে আফিম সারেন্ডার করতে বললেন এবং জোর করে ২১,০০০ হাজার বাক্স আফিম নিয়ে পুড়িয়ে দিলেন সেগুলো। ক্ষতির পরিমাণ জানেন? রাজাকে মুক্ত করতে যে পরিমাণ টাকা লাগে, অর্থাৎ ইংরেজিতে বলে “King’s Ransom” এর মত বড় অংক। আরেকভাবে বলি, এই ২১,০০০ বাক্সের আফিমের দাম ছিল সেই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুরো ১ বছরের সামরিক বাজেটের সমান! ব্রিটেনের ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক বণিকদের আর্তনাদ ছিল গগনবিদারি!

ব্রিটেনের চাই উন্মুক্ত বাণিজ্য আর চীনের দরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, নতুন নতুন আবিষ্কারে যাতায়াত হয়েছে অনেক সহজ আর তাই চীনের এই রক্ষণশীল নীতি ব্রিটেনের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না। তারা ৩টা লক্ষ্য সামনে নিয়ে সম্রাটের সাথে আলোচনা করা শুরু করলো,

১। ক্যান্টন সিস্টেম বাতিল করা। অর্থাৎ চীনের কঠোর বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি শিথিল করা

২। চীনে একটা ব্রিটিশ এম্বাসি করা বা চীনা সম্রাটের দরবারে কমপক্ষে একজন চিরস্থায়ী সদস্য থাকার ব্যবস্থা করা

৩। চীনের অদূরে একটা ছোটোখাটো দ্বীপ বর্গা পাওয়া যেখানের পোর্ট ব্রিটিশ নিয়মে চলবে, চীনা নিয়মে না।

ব্রিটিশরা অনেক আগে থেকেই এই নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছে, প্রতিবারই মারাত্মকভাবে অপমানিত হয়ে ফিরতে হয়েছে। এবার এজেন্ডায় যোগ হয়েছে এই আফিম পুড়ানোর লসের জ্বালা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা। ব্রিটিশরা আলোচনা করতে পাঠায় একজন সৎ সেনাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এলিয়টকে আর সাথে বেশ কিছু নতুন মডেলের সাজ-সরঞ্জামসহ যুদ্ধজাহাজ। ঘটনাচক্রে ছোটখাট সংঘাত বেধে যায় স্থানীয় চীনা সৈন্যদের সাথে ক্যানটনের আশেপাশে। ক্যাপ্টেন এলিয়ট খুব সহজেই তৎকালীন পরিত্যক্ত দ্বীপ হংকং সহ দুইটা দুর্গ-ওয়ালা দ্বীপ চুসান আর চুয়ানপি দখল করে নেন। লিন জেসুকে বহনকারী জাহাজ এলিয়টের দয়ায় ফেরত আসে। সংঘাতে হেরে যাওয়ায় লিন জেসুর জায়গায় সম্রাট নতুন প্রতিনিধি পাঠান, যার নাম চি শ্যান (Qi Shan)। সে এসে ক্যাপ্টেন এলিয়টের আলোচনায় বসে। উভয়পক্ষের সৎ অফিসার চি শ্যান (Qi Shan) আর এলিয়ট সমঝোতায় আসে। আফিম পুড়ানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে চীন দিবে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড, চীন ব্যবসা নীতি শিথিল করবে আর ব্রিটিশদেরকে এম্বেসী চালানোর পাশাপাশি হংকং দ্বীপে নিজেদের মত করে পোর্ট চালাতে দিবে। বিনিময়ে ব্রিটিশরা দখল করা দুর্গ ছেড়ে দিবে আর ব্রিটেন হংকং দ্বীপ কিনে নিবে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে। অর্থাৎ এলিয়ট ব্রিটিশদের সবগুলো এজেন্ডা বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে চলে আসে আর হেরে যাওয়া চীনারাও একটা গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় আসে। কিন্তু, শান্তি কি ফিরলো?

ব্রিটেনে ফিরতেই ক্যাপ্টেন এলিয়ট পড়লেন লর্ড পালমারস্টনের তোপের মুখে। লর্ড পালমারস্টোনের কথা হল, ৬ মিলিয়ন পাউন্ড সে দ্বীপের জন্য দিতে গেল কেন? সেটাতো ক্ষতিপূরণ হিসেবে পকেটে আসবে! আর ক্যান্টন বাদেও আরো পোর্টে ব্যবসা করার অনুমতি দরকার, সেটাও এলিয়ট আনে নাই। দখল করা দুই দুইটা দুর্গ ফেরত দিয়ে আসছে বেক্কলের মত এবং সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার আফিম লিগ্যাল করার ব্যাপারে

একটা কথাও বলে নাই এলিয়ট! কত্তবড় সাহস! সুতরাং এলিয়টকে ডিসমিস করে দেয়া হল।

ওদিকে চীনা সম্রাটের তোপের মুখে পড়ে মৃত্যুদন্ড পেয়ে বসলো চি শ্যান। সম্রাটের কথা হল, এত নতজানু হতে গেল কেন চি শ্যান, আরো শক্তিশালীভাবে ডিল করার দরকার ছিল। পরে প্রাণে বেঁচে গেলেও, দায়িত্বে আর ফিরতে পারে নাই চি শ্যান। তাঁর বদলে সম্রাট তাঁর ভাতিজাসহ মোট ৩ জন জেনারেল পাঠায় ইংরেজ সামলাতে। অর্থাৎ, চি শ্যান আর এলিয়টের মধ্যে প্রায় রক্তারক্তিহীন সমঝোতা ভেস্তে গেল।

এরপর কাহিনী স্পষ্ট, এবার ব্রিটিশ রয়াল নেভি আসছে একটা হেস্তনেস্ত করতে। এবার হয় ব্রিটেনের একদিন কি চীনের একদিন। হয় চীনারা ব্রিটিশদেরকে তাদের ভুমি থেকে হটিয়ে দিবে চিরতরে এবং নিজেদের শক্ত শর্তে ব্যবসা করতে বাধ্য করবে, নয়তো ব্রিটিশরা মহাপরাক্রমশালী চীনা সম্রাটকে উন্মুক্ত বাণিজ্যে বাধ্য করবে। উভয় পক্ষের কেউ আর যুদ্ধবিরতি, সমঝোতা কিংবা শান্তির পায়রা উড়ানোর মুডে নাই। ১৮৪১ সালের কথা, ব্রিটিশ রয়াল ফ্লিট এসেই নতুন করে চুসান আর চুয়ানপি দখল করে নেয়। এতে প্রায় ৬০০ চীনা সেনা মারা পড়ে আর ১০০ পড়ে ধরা। অপ্রতিরোধ্য ইংরেজরা দখল করে নেয় ক্যান্টন ও আশেপাশের সকল দুর্গ। চলতে থাকে প্রতিরোধ আর দখলের যুদ্ধ। যুদ্ধটা অনেকাংশেই অসম ছিল। কারণ, ব্রিটিশরা একদম আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত খুবই সুশৃঙ্খল সেনাদল আর চীনারা আফিমে আসক্ত হয়ে বিশৃঙ্খল ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৮৪২ সালে ব্রিটিশরা দখল করে নেয় বড় শহর সাংহাই (Shanghai) আর শেনজাং (Zhenjiang)। এর পরেই ব্রিটিশরা নানকিং (Nanking) দখলে মনযোগ দেয়...নানকিং একটা মারাত্মক কৌশলগত পয়েন্ট ছিল তখন। দুই পক্ষই জানত, এটাই আসলে শেষ যুদ্ধ। ব্রিটিশরা জানত যে তারা তৎকালীন রাজধানী বেইজিং দখল না করলেও চলবে। নানকিং এর অবস্থান ছিল চীনের প্রাণ ইয়াতসি (Yangtze) নদীর প্রবেশমুখে। এই নদী দিয়ে সারা

চীনে পণ্য সরবরাহ চলে, এই নদী দিয়েই রাজধানী বেইজিং চলে। সুতরাং নানকিং দখলে নেয়া মানে রাজধানীকে এক প্রকার কব্জা করে ফেলা। এই নদী অবরোধ মানে চীনা সম্রাটের টুঁটি চেপে ধরা। সম্রাটও এই বাস্তবতা জানতেন। তিনি জানতেন, নানকিং এর পরাজিত হলে আর কোন আলোচনায় বসা যাবে না, পুরো সম্রাজ্য হারাতে হবে। তাই আর নানকিং এর যুদ্ধ ঘটে নাই। চীনা সম্রাট আলোচনার টেবিলে চলে আসে।

এবার ব্রিটিশরা আদায় করে ২১ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ, একাধিক পোর্ট ব্যবসার জন্য খুলে দেয়া হয়, পোর্টগুলোতে ব্রিটিশ এম্বেসি প্রতিষ্ঠা করা হয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের আগের রক্ষণশীল শর্তগুলো শিথিল হয় এবং চীনারা এককভাবে শুল্ক নির্ধারণের ক্ষমতা হারায়। অর্থাৎ এরপর থেকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের শুল্ক হার নির্ধারণ হবে উভয়পক্ষে আলোচনার ভিত্তিতে। হংকং দ্বীপ চিরতরে ব্রিটিশদেরকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয় চীন এবং সেখানে সবসময় ব্রিটিশ আইন চলবে, এমন সমঝোতা হয়। মজার ব্যাপার হল, এতকিছুর পরেও চীনারা ২টা জিনিস কোনভাবেই মেনে নেয় নাই।

১। খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের অধিকার
২। আফিমের বৈধতা

আফিমের বৈধতা ব্রিটিশ সরকার কোনভাবেই আদায় করতে পারে নাই। এর ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই অন্যান্য কলোনিয়াল পাওয়ারের সম্মিলিত শক্তির সাথে আরেক দফা আফিম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে চীন!

এই দুই যুদ্ধ আর হেরে যাওয়ার তীক্ততা চীনারা কখনো ভুলে নাই। তারা এই চুক্তিগুলোকে অসম ও অন্যায্য চুক্তি আর এই সময়টার নাম দিয়েছে অপমানের শতাব্দী! চীনারা এখনো এখান থেকে শিক্ষা নেয়, পশ্চিমের সাথে কোন কিছুতে উলটাপালটা হলেই তাদের মনে পড়ে সেই অসম চুক্তির সময়ের কথা। জানা ইতিহাসের সবচেয়ে কম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলোর

একটা হল ব্রিটেন ও চীনের মধ্যকার এই আফিম যুদ্ধ। অথচ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই যুদ্ধের মর্ম ব্যাপক। এই যুদ্ধ বৈশ্বিক ব্যবসা ও অর্থনীতির অনেক রূপ পরিবর্তনের বিশাল নিয়ামক হয়ে আছে।

বাণিজ্য নীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকার

- মোহাইমিন পাটোয়ারি

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

প্রথমে আমরা বলেছি সুসম্পর্ক সবার জন্য সুফল বয়ে আনে। এই কথাটি সত্য। কিন্তু উৎপাদন সক্ষমতা যদি চাহিদার তুলনায় বেশি হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। বিষয়টি সহজভাবে বুঝতে মনে করুন, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান তৈরি পোশাক শিল্পে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলাদেশকে যদি এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় যে সব কলকারখানা খালি পড়ে আছে, শ্রমিকরা বেকার বসে আছে, সরকার কর পাচ্ছে না, বাংলাদেশ চাইবে পাকিস্তানের তৈরি পোশাক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হোক। কারণ, পাকিস্তানের ধ্বংস দ্বারা আন্তর্জাতিক পোশাক রপ্তানির বাজারে একটি শূণ্যস্থান তৈরি হবে যা আমরা পূরণ করতে পারবো। এভাবে প্রতিযোগী রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন নিজেদের উন্নয়নের রাস্তা পরিষ্কার করা সম্ভব। সেজন্যই আমরা দেখেছি আমেরিকার শ্রমিকরা যখন বেকার হয়ে পড়ছিল এবং সেখানে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তখন আমেরিকা চীনের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। কিছুদিন বাদে বেকারত্ব যখন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল তখন সে বাণিজ্য যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু এমন যদি হয় যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে ভালো আছে এবং একজনের জন্য আরেকজনের ব্যবসা থমকে রইছে না, সেক্ষেত্রে তারা চাইবে না একে অপরের সাথে সংঘর্ষে যেত; বরং শান্তিপূর্ণভাবে সহবস্থান নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে। একারণে আমরা দেখতে পাই স্পেন ও ইতালি, এই দুইটি দেশ জলপাই তেল রপ্তানিতে বিশ্ব সেরা হওয়া স্বত্তেও একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে না। কারণ তাদের পতিত জমি বা ক্রেতার সংকট নেই। সেই তুলনায় জ্বালানী তেলের বাজারে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো এর চাহিদা খনি থেকে উত্তোলনযোগ্য তেলের তুলনায় সীমিত। তাই জ্বালানী তেলের উত্তোলন নিয়ে সর্বদা রেষারেষি চলতে থাকে[3]।

শূণ্যস্থান পূরণ ছাড়া আরেকটি কারণে বাণিজ্য যুদ্ধ চলতে পারে। তা হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। উদারহণস্বরূপ, সৌদি আরব এবং ইরান উভয়ে উৎপাদনমূখী হওয়া স্বত্বেও একজন আরেকজনের ক্ষতি কামনা করে এই আশায় যে বাজারে জ্বালানী তেল ও গ্যাসের দাম বেড়ে যাবে এবং নিজেরা অধিক দামে তেল বিক্রি করতে পেড়ে লাভবান হবে। এই ধরণের বাস্তবতা আমরা

[3] বর্তমানে ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠায় আরেক সীমানায় সংঘর্ষ দানা বাঁধছে